# সূচী

# প্রথম ছত্রের সূচী

# উৎসর্গ

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রানী মহলানবীশ

ইঁটকাঠে গড়া নীরস খাঁচার থেকে
আকাশবিলাসী চিত্তেরে মোর এনেছিলে তুমি ডেকে
শ্যামল শুশ্রূষায়,
নারিকেলবন-পবন-বীজিত নিকুঞ্জ-আঙিনায়।
শরৎলক্ষ্মী কনকমাল্যে জড়ায় মেঘের বেণী,
নীলাম্বরের পটে আঁকে ছবি সুপারিগাছের শ্রেণী
দক্ষিণধারে পুকুরের ঘাট বাঁকা সে কোমরভাঙা,
লিলিগাছ দিয়ে ঢাকা তার ঢালু ডাঙা।
জামরুলগাছে ধরে অজস্র ফুল,
হরণ করেছে সুরবালিকার হাজার কানের দুল।
লতানে যূথীর বিতানে মৌমাছিরা
করিতেছে ঘুরা-ফিরা।
পুকুরের তটে তটে
মধুচ্ছন্দা রজনীগন্ধা সুগন্ধ তার রটে।
ম্যাগ্নোলিয়ার শিথিল পাপড়ি খ'সে খ'সে পড়ে ঘাসে,
ঘরের পিছন হতে বাতাবির ফুলের খবর আসে।
একসার মোটা পায়াভারি পাম্ উদ্ধত মাথাতোলা,
রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছে যেন বিলিতি পাহারাওলা।

বসি যবে বাতায়নে
কলমিশাকের পাড় দেখা যায় পুকুরের এক কোণে

৬

বিকেলবেলার আলো
জলে রেখা কাটে সবুজ সোনালি কালো।
ঝিলিমিলি করে আলোছায়া চুপে চুপে
চলতি হাওয়ার পায়ের চিহ্নরূপে।
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে
আমের শাখায় আঁখি ধেয়ে যায় সোনার রসের আশে।
লিচু ভরে যায় ফলে,
বাদুড়ের সাথে দিনে আর রাতে অতিথির ভাগ চলে।
বেড়ার ওপারে মৈসুমি ফুলে রঙের স্বপ্ন বোনা,
চেয়ে দেখে দেখে জানালার নাম রেখেছি—'নেত্রকোণা'।

ওরাওঁ জাতের মালি ও মালিনী ভোর হতে লেগে আছে—
মাটি খোঁড়াখুঁড়ি, জল ঢালাঢালি গাছে।
মাটিগড়া যেন নিটোল অঙ্গ, মাটির নাড়ীর টানে
গাছপালাদের স্বজাত ব'লেই জানে।
রাত পোহালেই পাড়ার গোয়ালা গাভীদুটি নিয়ে আসে,
অধীর বাছুর ছুটোছুটি করে পাশে।
সাড়ে ছ'টা বাজে, সোজা হয়ে রোদ চলে আসে মোর ঘরে,
পথে দেখা দেয় খবরওয়ালা বাইক-রথের 'পরে।
পাঁচিল পেরিয়ে পুরোনো দোতলা বাড়ি,
আলসের ধারে এলোকেশিনীরা ঝোলায় সিক্ত শাড়ি।
পাড়ার মেয়েরা জল নিতে আসে ঘাটে,
সবুজ গহনে দু চোখ ডুবিয়ে সোনার সকাল কাটে।

বাংলাদেশের বনপ্রকৃতির মন
শহর এড়িয়ে রচিল এখানে ছায়া দিয়ে ঘেরা কোণ।
বাংলাদেশের গৃহিণী তাহার সাথে
আপন স্নিগ্ধ হাতে

সেবার অর্ঘ্য করেছে রচনা নীরব প্রণতি-ভরা,
তারি আনন্দ কবিতায় দিল ধরা।

শুনেছি এবার হেথায় তোমার ক'দিনের ঘরবাড়ি
চলে যাবে তুমি ছাড়ি।
মেঘরৌদ্রের খেলার স্মৃষ্টি ঐ পুকুরের ধারে
লজ্জিত হবে অকবি ধনীর দৃষ্টির অধিকারে।
কালের লীলায় দিয়ে যাব সায়, খেদ রাখিব না চিতে—
এ ছবিখানি তো মন হতে ধনী পারিবে না কেড়ে নিতে।
তোমার বাগানে দেখেছি তোমারে কাননলক্ষ্মীসম—
তাহারি স্মরণ মম
শীতের রৌদ্রে, মুখর বর্ষারাতে
কুলায়বিহীন পাখির মতন
মিলিবে মেঘের সাথে।

শান্তিনিকেতন
১ ভাদ্র, ১৩৪৩

# শ্যামলী

# দ্বৈত

সেদিন ছিলে তুমি আলো-আঁধারের মাঝখানটিতে,
বিধাতার মানসলোকের
মর্তসীমায় পা বাড়িয়ে
বিশ্বের রূপ-আঙিনার নাছ্‌দুয়ারে।
যেমন ভোরবেলাকার একটুখানি ইশারা,
শালবনের পাতার মধ্যে উস্‌খুস্‌,
শেষরাত্রের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া
আলোর আড়-চাহনি ;
উষা যখন আপনা-ভোলা—
যখন সে পায় নি আপন ডাক-নামটি পাখির ডাকে,
পাহাড়ের চূড়ায়, মেঘের লিখনপত্রে।
তারপরে সে নেমে আসে ধরাতলে,
তার মুখের উপর থেকে
অসীমের ছায়া-ঘোমটা খসে পড়ে
উদয়সাগরের অরুণরাঙা কিনারায়।
পৃথিবী তাকে সাজিয়ে তোলে
আপন সবুজ-সোনার কাঁচলি দিয়ে ;
পরায় তাকে আপন হাওয়ার চুনরি।
তেমনি তুমি এনেছিলে তোমার ছবির তনুরেখাটুকু
আমার হৃদয়ের দিক্‌প্রান্তপটে।

আমি তোমার কারিগরের দোসর,
কথা ছিল তোমার রূপের 'পরে মনের তুলি
আমিও দেব বুলিয়ে,
পুরিয়ে তুলব তোমার গড়নটিকে।
দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।
আমার প্রাণের হাওয়া
বইয়ে দিয়েছি তোমার চারিদিকে
কখনো ঝড়ের বেগে
কখনো মৃদুমৃদু দোলনে।
একদিন আপন সহজ নিরালায় ছিলে তুমি অধরা,
ছিলে তুমি একলা বিধাতার ;
একের মধ্যে একঘরে।
আমি বেঁধেছি তোমাকে দুইয়ের গ্রন্থিতে,
তোমার সৃষ্টি আজ তোমাতে আর আমাতে,
তোমার বেদনায় আর আমার বেদনায়।
আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে।
আমার অবাক চোখ লাগিয়েছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া,
জাগিয়েছে আনন্দরূপ
তোমার আপন চৈতন্যে।

বরানগর
২৩ মে, ১৯৩৬

# শেষ পহরে

ভালোবাসার বদলে দয়া
যৎসামান্য সেই দান,
সেটা হেলাফেলারই স্বাদ-ভোলানো।
পথের পথিকও পারে তা বিলিয়ে দিতে
পথের ভিখারিকে,
শেষে ভুলে যায় বাঁক পেরতেই।
তার বেশি আশা করি নি সেদিন।

চলে গেলে তুমি রাতের শেষ প্রহরে।
মনে ছিল, বিদায় নিয়ে যাবে,
শুধু বলে যাবে, "তবে আসি।"
যে-কথা আর-একদিন বলেছিলে,
যা আর কোনোদিন শুনব না,
তার জায়গায় ঐ দুটি কথা,
ঐটুকু দরদের সরু বুননিতে যেটুকু বাঁধন পড়ে
তাও কি সইত না তোমার।

প্রথম ঘুম যেমনি ভেঙেছে
বুক উঠেছে কেঁপে—
ভয় হয়েছে, সময় বুঝি গেল পেরিয়ে।

ছুটে এলেম বিছানা ছেড়ে।
দূরে গির্জের ঘড়িতে বাজল সাড়ে বারোটা।
রইলেম বসে আমার ঘরের চৌকাঠে
দরজায় মাথা রেখে—
তোমার বেরিয়ে যাবার বারান্দার সামনে।
অতি সামান্য একটুখানি সুযোগ
অভাগীর ভাগ্য তাও নিল ছিনিয়ে,
পড়লেম ঘুমে ঢলে
তুমি যাবার কিছু আগেই।
আড়চোখে বুঝি দেখলে চেয়ে
এলিয়ে-পড়া দেহটা—
ডাঙায়-তোলা ভাঙা নৌকোটা যেন।
বুঝি সাবধানেই গেছ চলে,
ঘুম ভাঙে পাছে।
চমকে জেগে উঠেই বুঝেছি
মিছে হয়েছে জাগা।
বুঝেছি, যা যাবার তা গেছে এক নিমেষেই—
যা পড়ে থাকবার তাই রইল পড়ে
যুগযুগান্তর।

চুপচাপ চারিদিক—
যেমন চুপচাপ পাখিহারা পাখির বাসা
গানহারা গাছের ডালে।

কৃষ্ণসপ্তমীর মিইয়ে-পড়া জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশেছে
ভোরবেলাকার ফ্যাকাসে আলো,
ছড়িয়ে পড়েছে আমার পাণ্ডাশ-বরন শূন্য জীবনে।
গেলেম তোমার শোবার ঘরের দিকে
বিনা কারণে।
দরজার বাইরে জ্বলছে
ধোঁওয়ায়-কালি-পড়া হারিকেন লণ্ঠন,
বারান্দায় নিবো-নিবো শিখার গন্ধ।
ছেড়ে-আসা বিছানায় খোলা মশারি
একটু একটু কাঁপছে বাতাসে।
জানলার বাইরের আকাশে
দেখা যায় শুকতারা,
আশা-বিদায়-করা
যত ঘুমহারাদের সাক্ষী।
হঠাৎ দেখি, ফেলে গেছ ভুলে
সোনাবাঁধানো হাতির দাঁতের লাঠিগাছটা।
মনে হল, যদি সময় থাকে
তবে হয়তো স্টেশন থেকে ফিরে আসবে খোঁজ করতে—
কিন্তু ফিরবে না
আমার সঙ্গে দেখা হয় নি ব'লে।

বরানগর
২৩ মে, ১৯৩৬

# আমি

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
না, না, না—
না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ,
না-আমি, না-তুমি।

ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।
সেই আমির গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।
'না' কখন্ ফুটে উঠে হল 'হাঁ', মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

একে বোলো না তত্ত্ব;
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ

পণ্ডিত বলছেন—
বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।
একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্বতে;
মর্তলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিনরাতের জমাখরচ;
মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি।

মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,
বাজবে না সুর।
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
"তুমি সুন্দর",
"আমি ভালোবাসি"।
বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধ'রে।
প্রলয়সন্ধ্যায় জপ করবেন—
"কথা কও, কথা কও",
বলবেন "বলো, তুমি সুন্দর",
বলবেন "বলো, আমি ভালোবাসি" ?

শান্তিনিকেতন
২৯ মে, ১৯৩৬

## সম্ভাষণ

রোজই ডাকি তোমার নাম ধরে,

বলি 'চারু'।

হঠাৎ ইচ্ছা হল, আর-কিছু বলি,

যাকে বলে সম্ভাষণ,

যেমন বলত সত্যযুগের ভালোবাসায়।

সবচেয়ে সহজ ডাক— প্রিয়তমে

সেটা আবৃত্তি করেছি মনে মনে,

তার উত্তরে মনে-মনেই শুনেছি তোমার উচ্চহাসি।

বুঝেছি, মন্দমধুর হাসি এ যুগের নয় ;

এ যে নয় অবন্তী, নয় উজ্জয়িনী

আটপহুরে নামটাতে দোষ কী হল,

এই তোমার প্রশ্ন।

বলি তবে।

কাজ ছিল না বেশি,

সকাল সকাল ফিরেছি বাসায়।

হাতে বিকেলের খবরের কাগজ,

বসেছি বারান্দায়, রেলিঙে পা দুটো তোলা

হঠাৎ চোখে পড়ল পাশের ঘরে

তোমার বৈকালিকী সাজের ধারা।
বাঁধছিলে চুল আয়নার সামনে
বেণী পাকিয়ে পাকিয়ে, কাঁটা বিঁধে বিঁধে।
এমন মন দিয়ে দেখি নি তোমাকে অনেকদিন ;
দেখি নি এমন বাঁকা ক'রে মাথা-হেলানো
চুল-বাঁধার কারিগরিতে,
এমন তুই হাতের মিতালি
চুড়িবালার ঠুনঠুনির তালে।
শেষে ঐ ধানীরঙের আঁচলখানিতে
কোথাও কিছু ঢিল দিলে,
আঁট করলে কোথাও বা,
কোথাও একটু টেনে দিলে নিচের দিকে,
কবিরা যেমন ছন্দ বদল ক'রে
একটু আধটু বাঁকিয়ে চুরিয়ে।

আজ প্রথম আমার মনে হল,
অল্প মজুরির দিন-চালানো
একটা মানুষের জন্যে
নিজেকে তো সাজিয়ে তুলছে
আমাদের ঘরের পুরোনো বউ
দিনে দিনে নতুন-দাম-দেওয়া রূপে।
এ তো নয় আমার আটপহুরে চারু

ঠিক এমনি করেই দেখা দিত অন্যযুগের অবন্তিকা
ভালোলাগার অপরূপ বেশে
ভালোবাসার চকিত চোখে।
অমরুশতকের চৌপদীতে—
শিখরিণীতে হোক, স্রগ্ধরায় হোক—
ওকে তো ঠিক মানাত।
সাজের ঘর থেকে বসবার ঘরে
ঐ যে আসছে অভিসারিকা,
ও যেন কাছের কালে আসছে
দূরের কালের বাণী।

বাগানে গেলেম নেমে।
ঠিক করেছি, আমিও আমার সোহাগকে দেব মর্যাদা
শিল্পে-সাজিয়ে-তোলা মানপত্রে।
যখন ডাকব তোমাকে ঘরে
সে হবে যেন আবাহনী।
সামনেই লতা ভরেছে সাদা ফুলে—
বিলিতী নাম, মনে থাকে না—
নাম দিয়েছি তারাঝরা;
রাতের বেলায় গন্ধ তার
ফুলবাগানের প্রলাপের মতো।
এবার সে ফুটেছে অকালে,
সবুর সয় নি শীত ফুরোবার।

এনেছি তার একটি গুচ্ছ,
তারও একটি সই থাকবে আমার নিবেদনে।

আজ গোধূলিলগ্নে তুমি ক্লাসিকযুগের চারুপ্রভা,
আমি ক্লাসিকযুগের অজিতকুমার।
দুটি কথা আজ বলব আমি,
সাজানো কথা—
হাসতে হয় হেসো।
সে কথা মনে-মনে গড়ে তুলেছি
যেমন ক'রে তুমি জড়িয়ে তুলেছ তোমার খোঁপা।
বলব, "প্রিয়ে, এই পরদেশী ফুলের মঞ্জরী
আকাশে চেয়ে খুঁজছিল বসন্তের রাত্রি,
এনেছি আমি তাকে দয়া করে
তোমার ঐ কালো চুলে।"

শান্তিনিকেতন
৩০ মে, ১৯৩৬

## স্বপ্ন

ঘন অন্ধকার রাত,
বাদলের হাওয়া
এলোমেলো ঝাপট দিচ্ছে চারদিকে।
মেঘ ডাকছে গুরুগুরু,
থর্‌থর্ করছে দরজা,
খড়্‌খড়্ করে উঠছে জানলাগুলো।
বাইরে চেয়ে দেখি,
সারবাঁধা সুপুরি-নারকেলের গাছ
অস্থির হয়ে দিচ্ছে মাথা-ঝাঁকানি।
দুলে উঠছে কাঁঠালগাছের ঘন ডালে
অন্ধকারের পিণ্ডগুলো
দল-পাকানো প্রেতের মতো।
রাস্তার থেকে পড়েছে আলোর রেখা
পুকুরের কোণে,
সাপ-খেলানো, আঁকাবাঁকা।

মনে পড়ছে ঐ পদটা—
"রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া-গরজন·
স্বপন দেখিনু হেনকালে।"

সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন্ একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার-কুঁড়ি-ধরা তার মন।
মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে-কাজল-পরা,
ঘাটের থেকে নীলশাড়ি-
'নিঙাড়ি নিঙাড়ি'-চলা।

আজ এই ঝোড়ো রাতে
তাকে মনে আনতে চাই—
তার সকালে, তার সাঁঝে,
তার ভাষায়, তার ভাবনায়,
তার চোখের চাহনিতে—
তিন-শো বছর আগেকার
কবির জানা সেই বাঙালির মেয়েকে।
দেখতে পাই নে স্পষ্ট করে
আজ পড়েছে যাদের পিছনের ছায়ায়
তারা শাড়ির আঁচল যেমন করে বাঁধে কাঁধের 'পরে,
খোঁপা যেমন করে ঘুরিয়ে পাকায়
পিছনে নেমে-পড়া,
মুখের দিকে যেমন করে চায় স্পষ্টচোখে

তেমন ছবিটি ছিল না

সেই তিন-শো বছর আগেকার কবির সামনে

তবু— "রজনী শাঙন ঘন …

স্বপন দেখিনু হেনকালে।"

শ্রাবণের রাত্রে এমনি করেই বয়েছে সেদিন

বাদলের হাওয়া,

মিল রয়ে গেছে

সেকালের স্বপ্নে আর একালের স্বপ্নে।

শান্তিনিকেতন

৩০ মে, ১৯৩৬

## প্রাণের রস

আমাকে শুনতে দাও,
আমি কান পেতে আছি।
পড়ে আসছে বেলা ;
পাখিরা গেয়ে নিচ্ছে দিনের শেষে
কণ্ঠের সঞ্চয় উজাড় ক'রে দেবার গান।
ওরা আমার দেহমনকে নিল টেনে
নানা সুরের নানা রঙের
নানা খেলার
প্রাণের মহলে।
ওদের ইতিহাসের আর কোনো সাড়া নেই,
কেবল এইটুকু কথা—
আছি, আমরা আছি, বেঁচে আছি,
বেঁচে আছি এই আশ্চর্য মুহূর্তে।
এই কথাটুকু পৌঁছল আমার মর্মে।
বিকালবেলায় মেয়েরা জল ভরে নিয়ে যায় ঘটে,
তেমনি করে ভরে নিচ্ছি প্রাণের এই কাকলি
আকাশ থেকে
মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে।

আমাকে একটু সময় দাও।
আমি মন পেতে আছি

ভাঁটা-পড়া বেলায়,
ঘাসের উপরে ছড়িয়ে পড়া বিকেলের আলোতে
গাছেদের নিস্তব্ধ খুশি,
মজ্জার মধ্যে লুকোনো খুশি,
পাতায় পাতায় ছড়ানো খুশি।
আমার প্রাণ নিজেকে বাতাসে মেলে দিয়ে
নিচ্ছে বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস
চেতনার মধ্যে দিয়ে ছেঁকে।
এখন আমাকে বসে থাকতে দাও,
আমি চোখ মেলে থাকি।

তোমরা এসেছ তর্ক নিয়ে।
আজ দিনান্তের এই পড়ন্ত রোদ্দুরে
সময় পেয়েছি একটুখানি :
এর মধ্যে ভালো নেই, মন্দ নেই,
নিন্দা নেই, খ্যাতি নেই।
দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই—
আছে বনের সবুজ,
জলের ঝিকিমিকি—
জীবনস্রোতের উপরতলে
অল্প একটু কাঁপন, একটু কল্লোল,
একটু ঢেউ।
আমার এই একটুখানি অবসর

উড়ে চলেছে
ক্ষণজীবী পতঙ্গের মতো
সূর্যাস্তবেলার আকাশে
রঙিন ডানার শেষখেলা চুকিয়ে দিতে—
বৃথা প্রশ্ন কোরো না।

বৃথা এনেছ তোমাদের যত দাবি।
আমি বসে আছি বর্তমানের পিছনমুখে
অতীতের দিকে গড়িয়ে পড়া ঢালুতটে।
নানান বেদনায় ধেয়ে বেড়ানো প্রাণ
একদিন করে গেছে লীলা
ঐ বনবীথির ডাল দিয়ে বিনুনি করা
আলোছায়ায়।
আশ্বিনে দুপুরবেলা
এই কাঁপনলাগা ঘাসের উপর,
মাঠের পারে, কাশের বনে,
হাওয়ায় হাওয়ায় স্বগত উক্তি
মিলেছে আমার জীবনবীণার ফাঁকে ফাঁকে।

যে-সমস্যাজাল
সংসারের চারিদিকে পাকে পাকে জড়ানো

তার সব গিঁঠ গেছে ঘুচে।
যাবার পথের যাত্রী পিছনে যায় নি ফেলে
কোনো উদ্যোগ, কোনো উদ্‌বেগ, কোনো আকাঙ্ক্ষা ;
কেবল গাছের পাতার কাঁপনে
এই বাণীটি রয়ে গেছে—
তারাও ছিল বেঁচে,
তারা যে নেই তার চেয়ে সত্য ঐ কথাটি।
শুধু আজ অনুভবে লাগে
তাদের কাপড়ের রঙের আভাস,
পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার হাওয়া,
চেয়ে দেখার বাণী,
ভালোবাসার ছন্দ—
প্রাণগঙ্গার পূর্বমুখী ধারায়
পশ্চিম প্রাণের যমুনার স্রোত।

শান্তিনিকেতন
১ জুন, ১৯৩৬

## হারানো মন

দাঁড়িয়ে আছ আড়ালে.
ঘরে আসবে কিনা ভাবছ সেই কথা।
একবার একটু শুনেছি চুড়ির শব্দ।
তোমার ফিকে পাটকিলে রঙের আঁচলের একটুখানি
দেখা যায়, উড়ছে বাতাসে
দরজার বাইরে।
তোমাকে দেখতে পাচ্ছি নে,
দেখছি পশ্চিম আকাশের রোদ্‌দুর
চুরি করেছে তোমার ছায়া,
ফেলে রেখেছে আমার ঘরের মেঝের 'পরে।

দেখছি শাড়ির কালো পাড়ের নিচে থেকে
তোমার কনক-গৌরবর্ণ পায়ের দ্বিধা
ঘরের চৌকাঠের উপর।
আজ ডাকব না তোমাকে।
আজ ছড়িয়ে পড়েছে আমার হালকা চেতনা—
যেন কৃষ্ণপক্ষের গভীর আকাশে নীহারিকা,
যেন বর্ষণশেষে মিলিয়ে আসা সাদা মেঘ
শরতের নীলিমায়।

আমার ভালোবাসা
যেন সেই আল-ভেঙে-যাওয়া খেতের মতো
অনেকদিন হল চাষী যাকে
ফেলে দিয়ে গেছে চলে ;
আনমনা আদিপ্রকৃতি
তার উপরে বিছিয়েছে আপন স্বত্ব
নিজের অজানিতে।
তাকে ছেয়ে উঠেছে ঘাস,
উঠেছে অনামা গাছের চারা,
সে মিলে গেছে চারদিকের বনের সঙ্গে।
সে যেন শেষরাত্রির শুকতারা,
প্রভাত-আলোয় ডুবিয়ে দিল
তার আপন আলোর ঘটখানি।

আজ কোনো-সীমানা-দেওয়া নয় আমার মন,
হয়তো তাই ভুল বুঝবে আমাকে।
আগেকার চিহ্নগুলো সব গেছে মুছে,
আমাকে এক ক'রে নিতে পারবে না কোনোখানে
কোনো বাঁধনে বেঁধে।

শান্তিনিকেতন
১ জুন, ১৯৩৬

## চিরযাত্রী

অস্পষ্ট অতীত থেকে বেরিয়ে পড়েছে ওরা দলে দলে,
ওরা সন্ধানী, ওরা সাধক,
বেরিয়েছে পুরাপৌরাণিক কালের
সিংহদ্বার দিয়ে।
তার তোরণের রেখা
আঁচড় কেটেছে অজানা আখরে,
ভেঙে-পড়া ভাষায়।

যাত্রী ওরা, রণযাত্রী,
ওদের চিরযাত্রা অনাগতকালের দিকে।
যুদ্ধ হয় নি শেষ,
বাজছে নিত্যকালের দুন্দুভি।
বহুশত যুগের পদপতনশব্দে
থর্‌থর্‌ করে ধরিত্রী,
অর্ধেক রাত্রে দুরুদুরু করে বক্ষ,
চিত্ত হয় উদাস,
তুচ্ছ হয় ধনমান,
মৃত্যু হয় প্রিয়।
তেজ ছিল যাদের মজ্জায়,

যারা চলতে বেরিয়েছিল পথে
মৃত্যু পেরিয়ে আজও তারাই চলেছে
যারা বাস্তু ছিল আঁকড়িয়ে
তারা জীয়ন-ম     তাদের নিঝুম বস্তি
বোবা সমুদ্রের বালুর ডাঙায়
তাদের জগৎজোড়া প্রেতস্থানে
অশুচি হাওয়ায়
কে তুলবে ঘর,
কে রইবে চোখ উলটিয়ে কপালে,
কে জমাবে জঞ্জাল।

কোন্ আদিকালে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে
বিশ্বপথের চৌমাথায়।
পাথেয় ছিল রক্তে, পাথেয় ছিল স্বপ্নে,
পাথেয় ছিল পথেই।
যেই এঁকেছে নকশা,
ঘর বেঁধেছে পাকা গাঁথুনির,
ছাদ তুলেছে মেঘ ঘেঁষে-
পরের দিন থেকে মাটির তলায়
ভিত হয়েছে ঝাঁঝরা;
সে বাঁধ বেঁধেছে পাথরে পাথরে,
তলিয়ে গেছে বন্যার ধাক্কায়।
সারারাত হিসেব করেছে স্থাবর সম্পদের,
রাতের শেষ হিসেবে বেরল সর্বনাশ।

সে জমা করেছে ভোগের ধন সাত হাট থেকে ;
ভোগে লেগেছে আগুন,
আপন তাপে গুম্‌রে গুম্‌রে
গেছে ভোগের জোগান আঙার হয়ে।
তার রীতি, তার নীতি, তার শিকল, তার খাঁচা
চাপা পড়েছে মাটির নিচে
গতযুগের কবরস্থানে।

কখনও বা ঘুমিয়েছে সে
ঝিমিয়ে-পড়া নেশার আসরে বাতি-নেবা দালানে
আরামের গদি পেতে।
অন্ধকারে ঝোপের থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্কন্ধকাটা দুঃস্বপ্ন,
পাগলা জন্তুর মতো
গোঁগোঁঃ শব্দে ধরেছে তার টুঁটি চেপে,
বুকের পাঁজরগুলোয় ঠক্ ঠক্ দিয়েছে নাড়া,
গুঙরে উঠে জেগেছে সে মৃত্যুযন্ত্রণায়।
ক্ষোভের মাতুনিতে ভেঙে ফেলেছে মদের পাত্র,
ছিঁড়ে ফেলেছে ফুলের মালা।
বারে বারে রক্তে-পিছল দুর্গমে
ছুটে এসেছে শতচ্ছিদ্র শতাব্দীর বাইরে
পথ-না-চেনা দিক্‌সীমানার অলক্ষ্যে

তার হৃৎপিণ্ডের রক্তের ধাক্কায় ধাক্কায়
ডমরুতে বেজেছে গুরু গুরু—
"পেরিয়ে চলো, পেরিয়ে চলো।"

ওরে চিরপথিক,
করিস নে নামের মায়া,
রাখিস নে ফলের আশা,
ওরে ঘরছাড়া মানুষের সন্তান।
কালের রথচলা রাস্তায়
বারে বারে কারা তুলেছিল জয়ের নিশান,
বারে বারে পড়েছে চুরমার হয়ে
মানুষের কীর্তিনাশা সংসারে।
লড়াইয়ে-জয়-করা রাজত্বের প্রাচীর
সে পাকা করতে গেছে ভুল সীমানায়।
সীমানাভাঙার দল ছুটে আসছে
বহু যুগ থেকে
বেড়া ডিঙিয়ে, পাথর গুঁড়িয়ে,
পার হয়ে পর্বত;
আকাশে বেজে উঠছে নিত্যকালের দুন্দুভি-
"পেরিয়ে চলো,
পেরিয়ে চলো।"

শান্তিনিকেতন
৪ জুন, ১৯৩৬

# বিদায়বরণ

চারপ্রহর রাতের বৃষ্টিভেজা ভারি হাওয়ায়
থমকে আছে সকালবেলাটা,
রাত-জাগার ভারে যেন মুদে এসেছে
মলিন আকাশের চোখের পাতা।
বাদলার পিছল পথে পা টিপে চলেছে প্রহরগুলো।
যত সব ভাবনার আবছায়া
উড়ছে ঝাঁক বেঁধে মনের চারদিকে
হালকা বেদনার রঙ মেলে দিয়ে।

তাদের ধরি-ধরি করে মনটা ;
ভাবি, বেঁধে রাখি লেখায় ;
পাশ কাটিয়ে চলে যায় কথাগুলো।
এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যতকিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া—
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি
যেন ঘোমটাপরা অভিমানিনী।

মন বলছে, ডাকো ডাকো,
ঐ ভেসে-যাওয়া পারের খেয়ার আরোহিণী,
ওকে একবার ডাকো ফিরে ;
দিনান্তের সন্ধ্যাদীপটি তুলে ধরো
ওর মুখের দিকে ;
করো ওকে বিদায়বরণ ।
বলো, "তুমি সত্য, তুমি মধুর,
তোমারই বেদনা আজ লুকিয়ে বেড়ায়
বসন্তের ফুলফোটা আর ফুলঝরার ফাঁকে ।
তোমার ছবি-আঁকা অক্ষরের লিপিখানি
সবখানেই,
নীলে সবুজে সোনায়
রক্তের রাঙা রঙে ।"

তাই আমার আজ মন ভেসেছে
পলাশবনের চিকন ঢেউয়ে,
ফাটা মেঘের কিনার দিয়ে উপচে পড়া
আচমকা রোদ্‌দুরের ছটায় ।

শান্তিনিকেতন
৩ জুন, ১৯৩৬

# তেঁতুলের ফুল

জীবনে অনেক ধন পাই নি,
নাগালের বাইরে তারা ;
হারিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি
হাত পাতি নি বলেই ।
সেই চেনা সংসারে
অসংস্কৃত পল্লীরূপসীর মতো
ছিল এই ফুল মুখঢাকা—
অকাতরে উপেক্ষা করেছে উপেক্ষাকে,
এই তেঁতুলের ফুল ।

বেঁটে গাছ পাঁচিলের ধারে,
বাড়তে পারে নি কৃপণ মাটিতে ;
উঠেছে ঝাঁকড়া ডাল মাটির কাছ ঘেঁষে ।
ওর বয়স হয়েছে, যায় নি বোঝা ।

অদূরে ফুটেছে নেবুফুল,
গাছ ভরেছে গোলকচাঁপায়,
কোণের গাছে ধরেছে কাঞ্চন,
কুড়চিশাখা ফুলের তপস্যায় মহাশ্বেতা

স্পষ্ট ওদের ভাষা,

ওরা আমাকে ডাক দিয়ে করেছে আলাপ।

আজ যেন হঠাৎ এল কানে

কোন্ ঘোমটার নিচে থেকে চুপিচুপি কথা ;

দেখি, পথের ধারে তেঁতুলশাখার কোণে

লাজুক একটি মঞ্জরী,

মৃদু বসন্তী রঙ,

মৃদু একটি গন্ধ,

চিকন লিখন তার পাপড়ির গায়ে।

শহরের বাড়িতে আছে

শিশুকাল থেকে চেনাশোনা অনেক কালের তেঁতুলগাছ,

দিক্‌পালের মতো দাঁড়িয়ে

উত্তরপশ্চিম কোণে,

পরিবারের যেন পুরোনো কালের সেবক,

প্রপিতামহের বয়সি।

এই বাড়ির অনেক জন্মমৃত্যুর পর্বের পর পর্বে

সে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে,

যেন বোবা ইতিহাসের সভাপণ্ডিত।

ঐ গাছে ছিল যাদের নিশ্চিত দখল কালে কালে

তাদের কত লোকের নাম

আজ ওর ঝরা পাতার চেয়েও ঝরা,

তাদের কত লোকের স্মৃতি

ওর ছায়ার চেয়েও ছায়া।

একদিন ঘোড়ার আস্তাবল ছিল ওর তলায়,
খুরের খট্‌খটানিতে অস্থির,
খোলার-চালা-দেওয়া ঘরে।
কবে চলে গেছে সহিসের হাঁক-ডাকা
সেই ঘোড়া-বাহনের যুগ
ইতিবৃত্তের ওপারে।
আজ চুপ হয়েছে হ্রেষাধ্বনি,
রঙ বদল করেছে কালের ছবি।
সর্দার কোচ্‌ম্যানের সযত্নসজ্জিত দাড়ি,
চাবুক-হাতে তার সগর্ব উদ্ধত পদক্ষেপ,
সেদিনকার শৌখিন সমারোহের সঙ্গে
গেছে সাজ-পরিবর্তনের মহানেপথ্যে।
দশটা বেলার প্রভাতরৌদ্রে
ঐ তেঁতুলতলা থেকে এসেছে দিনের পর দিন
অবিচলিত নিয়মে ইস্কুলে যাবার গাড়ি।
বালকের নিরুপায় অনিচ্ছার বোঝাটা
টেনে নিয়ে গেছে রাস্তার ভিড়ের মাঝখান দিয়ে।

আজ আর চেনা যাবে না সেই ছেলেকে—
না দেহে, না মনে, না অবস্থায়।
কিন্তু, চিরদিন দাঁড়িয়ে আছে
সেই আত্মসমাহিত তেঁতুলগাছ
মানবভাগ্যের ওঠানামার প্রতি
ভ্রূক্ষেপ না ক'রে।

মনে আছে একদিনের কথা,
রাত্রি থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ;
ভোরের বেলায় আকাশের রঙ
যেন পাগলের চোখের তারা।
দিক্‌হারানো ঝড় বইছে এলোমেলো,
বিশ্বজোড়া অদৃশ্য খাঁচায় মহাকায় পাখি
চারদিকে ঝাপট মারছে পাখা।
রাস্তায় দাঁড়ালো জল,
আঙিনা গেছে ভেসে।
বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি,
ক্রুদ্ধ মুনির মতো ঐ গাছ মাথা তুলেছে আকাশে,
তার শাখায় শাখায় ভর্ৎসনা।
গলির দুইধারে কোঠাবাড়িগুলো হতবুদ্ধির মতো,
আকাশের অত্যাচারে
প্রতিবাদ করবার ভাষা নেই তাদের।
একমাত্র ঐ গাছটার পত্রপুঞ্জের আন্দোলনে
আছে বিদ্রোহের বাণী,
আছে স্পর্ধিত অভিসম্পাত।
অন্তহীন ইটকাঠের মূক জড়তার মধ্যে
ঐ ছিল একা মহারণ্যের প্রতিনিধি ;
সেদিন দেখেছি তার বিক্ষুব্ধ মহিমা বৃষ্টিপাণ্ডুর দিগন্তে।

কিন্তু, যখন বসন্তের পর বসন্ত এসেছে
অশোক বকুল পেয়েছে সম্মান ;

ওকে জেনেছি যেন ঋতুরাজের বাহির-দেউড়ির দ্বারী,
উদাসীন, উদ্ধত।
সেদিন কে জেনেছিল—
ঐ রূঢ় বৃহতের অন্তরে সুন্দরের নম্রতা,
কে জেনেছিল বসন্তের সভায় ওর কৌলিন্য।

ফুলের পরিচয়ে আজ ওকে দেখছি
যেন গন্ধর্ব চিত্ররথ,
যে ছিল অর্জুনবিজয়ী মহারথী
গানের সাধন করছে সে আপন-মনে একা
নন্দনবনের ছায়ার আড়ালে গুন্‌গুন্‌ সুরে।
সেদিনকার কিশোর কবির চোখে
ঐ প্রৌঢ় গাছের গোপন যৌবনমদিরতা
যদি ধরা পড়ত উপযুক্ত লগ্নে,
মনে আসছে, তবে
মৌমাছির পাখা-উতল-করা
কোন্‌-এক পরম দিনের তরুণ প্রভাতে
একটি ফুলের গুচ্ছ করতেম চুরি,
পরিয়ে দিতেম কেঁপে-ওঠা আঙুল দিয়ে
কোন্‌-একজনের আনন্দে-রাঙা কর্ণমূলে।
যদি সে সুধাত, কী নাম,
হয়তো বলতেম,—
ঐ যে রৌদ্রের এক টুকরো পড়েছে তোমার চিবুকে
ওর যদি কোনো নাম তোমার মুখে আসে
একেও দেব সেই নামটি।

শান্তিনিকেতন
৭ জুন, ১৯৩৬

## অকাল ঘুম

এসেছি অনাহূত।
কিছু কৌতুক করব ছিল মনে—
আচমকা বাধা দেব অসময়ে
কোমরে-আঁচল-জড়ানো গৃহিণীপনায়।
দুয়ারে পা বাড়াতেই চোখে পড়ল—
মেঝের 'পরে এলিয়ে-পড়া
ওর অকাল ঘুমের রূপখানি।

দূর পাড়ায় বিয়েবাড়িতে বাজছে শানাই সারঙ সুরে।
প্রথম প্রহর পেরিয়ে গেছে
জ্যৈষ্ঠরৌদ্রে ঝামরে-পড়া সকালবেলায়।
স্তরে স্তরে দুখানি হাত গালের নিচে,
ঘুমিয়েছে শিথিলদেহে
উৎসবরাতের অবসাদে
অসমাপ্ত ঘরকন্নার একধারে।
কর্মস্রোত নিস্তরঙ্গ ওর অঙ্গে অঙ্গে,
অনাবৃষ্টিতে অজয়নদের
প্রান্তশায়ী শ্রান্ত জলশেষের মতো।
ঈষৎ খোলা ঠোঁটদুটিতে মিলিয়ে আছে
মুদে-আসা ফুলের মধুর উদাসীনতা।

দুটি ঘুমন্ত চোখের কালো পক্ষ্মচ্ছায়া
পড়েছে পাণ্ডুর কপোলে।

ক্লান্ত জগৎ চলেছে পা টিপে
ওর খোলা জানলার সামনে দিয়ে
ওর শান্ত নিশ্বাসের ছন্দে।
ঘড়ির ইশারা
বধির ঘরে টিক্‌টিক্ করছে কোণের টেবিলে,
বাতাসে দুলছে দিনপঞ্জী দেয়ালের গায়ে।
চলতি মুহূর্তগুলি গতি হারালো ওর স্তব্ধ চেতনায়,
মিলল একটি অনিমেষ মুহূর্তে;
ছড়িয়ে দিল তার অশরীরী ডানা
ওর নিবিড় নিদ্রার 'পরে।
ওর ক্লান্ত দেহের করুণ মাধুরী মাটিতে মেলা,
যেন পূর্ণিমারাতের ঘুমহারানো অলস চাঁদ
সকালবেলায় শূন্য মাঠের শেষ সীমানায়।

পোষা বিড়াল দুধের দাবি স্মরণ করিয়ে
ডাক দিল ওর কানের কাছে।
চমকে জেগে উঠে দেখল আমাকে,
তাড়াতাড়ি বুকে কাপড় টেনে
অভিমানভরে বললে, "ছি, ছি,
কেন জাগালে না এতক্ষণ।"

কেন। আমি তার জবাব দিই নি ঠিকমতো

যাকে খুব জানি তাকেও সব জানি নে
এই কথা ধরা পড়ে কোনো একটা আকস্মিকে।
হাসি আলাপ যখন আছে থেমে,
মনে যখন থমকে আছে প্রাণের হাওয়া,
তখন সেই অব্যক্তের গভীরে
এ কী দেখা দিল আজ।
সে কি অস্তিত্বের সেই বিষাদ
যার তল মেলে না,
সে কি সেই বোবার প্রশ্ন
যার উত্তর লুকাচুরি করে রক্তে,
সে কি সেই বিরহ
যার ইতিহাস নেই,
সে কি অজানা বাঁশির ডাকে অচেনা পথে স্বপ্নে চলা।
ঘুমের স্বচ্ছ আকাশতলে
কোন্ নির্বাক্ রহস্যের সামনে ওকে নীরবে সুধিয়েছি,—
"কে তুমি।
তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন্ লোকে।"

সেদিন সকালে গলির ওপারে পাঠশালায়
ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ছিল নামতা ;
পাট-বোঝাই মোষের গাড়ি

চাকার ক্লিষ্টশব্দে মুচড়ে দিচ্ছিল বাতাসকে ;
ছাদ পিটচ্ছিল পাড়ার কোন্ বাড়িতে ;
জানলার নিচে বাগানে
চালতা গাছের তলায়
উচ্ছিষ্ট আমের আঁঠি নিয়ে
টানাটানি করছিল একটা কাক

আজ এ সমস্তর উপরেই ছড়িয়ে পড়েছে
সেই দূরকালের মায়ারশ্মি।
ইতিহাসে-বিলুপ্ত
তুচ্ছ এক মধ্যাহ্নের আলস্য-আবিষ্ট রৌদ্রে
এরা অপরূপের রসে রইল ঘিরে
অকাল ঘুমের একখানি ছবি

শান্তিনিকেতন
১০ জুন, ১৯৩৬

## কণি

আমরা ছিলেম প্রতিবেশী।
যখন-তখন দুই বাসার সীমা ডিঙিয়ে
যা-খুশি ক'রে বেড়াত কণি—
খালি পা, খাটো ফ্রকপরা মেয়ে ;
দুষ্টু চোখদুটো
যেন কালো আগুনের ফিনকি-ছড়ানো।
ছিপ্‌ছিপে শরীর।
ঝাঁকড়া চুল চায় না শাসন মানতে,
বেণী বাঁধতে মাকে পেতে হত দুঃখ।
সঙ্গে সঙ্গে সারাক্ষণ লাফিয়ে বেড়াত
কোঁকড়া-লোমওয়ালা বেঁটে জাতের কুকুরটা-
ছন্দের মিলে বাঁধা
দুজনে যেন একটি দ্বিপদী

আমি ছিলেম ভালো ছেলে,
ক্লাসের দৃষ্টান্তস্থল।
আমার সেই শ্রেষ্ঠতার
কোনো দাম ছিল না ওর কাছে।
যে-বছর প্রোমোশন পাই দু ক্লাস ডিঙিয়ে
লাফিয়ে গিয়ে ওকে জানাই—

ও বলে, "ভারি তো!
কী বলিস, টেমি।"
ওর কুকুরটা ডেকে ওঠে,—
"ঘেউ।"

ও ভালোবাসত হঠাৎ ভাঙতে আমার দেমাক,
রুখিয়ে তুলতে ঠাণ্ডা ছেলেটাকে ;
যেমন ভালোবাসত
দম্ ক'রে ফাটিয়ে দিতে মাছের পটকা।
ওকে জব্দ করার চেষ্টা
ঝরনার গায়ে নুড়ি-ছুঁড়ে-মারা।
কলকল হাসির ধারায়
বাধা দিত না কিছুতেই।

মুখস্থ করতে বসেছি সংস্কৃত শব্দরূপ
চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে,
ও হঠাৎ কখন্ দুম্ ক'রে
পিঠে মেরে গেল কিল
অত্যন্ত প্রাকৃত-রীতিতে।
সংস্কৃতের অপভ্রংশ
মুখ থেকে ভ্রষ্ট হবার পূর্বেই
বেণীটুকুর দোলন দেখিয়ে দিল দৌড়

মেয়ের হাতের সহাস্য অপমান
সহজে সম্ভোগ করবার বয়স
তখনও আমার ছিল অল্প দূরে
তাই শাসনকর্তা ছুটত ওর অনুসরণে,
প্রায় পৌঁছতে পারে নি লক্ষ্যে।
ওর বিলীয়মান শব্দভেদী হাসি
শুনেছি দূর থেকে,
হাতের কাছে পাই নি
কোনো দায়িত্ববিশিষ্ট জীব—
কোনো বেদনাবিশিষ্ট সত্তা।

এমনিতরো ছিল আমাদের আদ্যযুগ,
ছোটো মেয়ের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত।
ছুরন্তকে শাসনের ইচ্ছা করেছি
পুরুষোচিত অসহিষ্ণুতায়;
শুনেছি ব্যর্থচেষ্টার জবাবে
তীব্রমধুর কণ্ঠে,—
"ছুয়ো, ছুয়ো, ছুয়ো।"
বাইরে থেকে হারের পরিমাণ
বেড়ে চলেছে যখন
তখন হয়তো জিত হয়েছে শুরু
ভিতর থেকে।

সেই বেতার বার্তার কান খোলে নি তখনো,
যদিও প্রমাণ হচ্ছিল জড়ো।

ইতিমধ্যে আমাদের জীবননাট্যে
সাজ হয়েছে বদল।
ও পরেছে শাড়ি,
আঁচলে বিঁধিয়েছে ব্রোচ,
বেণী জড়িয়েছে হাল ফেশানের খোঁপায়।
আমি ধরেছি খাকি রঙের খাটো প্যাণ্ট্
আর খেলোয়াড়ের জামা
ফুটবল-বলরামের নকলে।
ভিতরের দিকে ভাবের হাওয়ারও
বদল হল শুরু,
কিছু তার পাওয়া যায় পরিচয়।

একদিন কণির বাবা পড়ছেন বসে
ইংরেজি সাপ্তাহিক।
বড়ো লোভ আমার ঐ ছবির কাগজটার 'পরে।
আমি লুকিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছি
উড়ো জাহাজের নকশা।
জানতে পেরে তিনি উঠলেন হেসে।
তিনি ভাবতেন, ছেলেটার বিদ্যার দম্ভ বেশি।

সেটা তাঁরও ছিল ব'লেই
আর কারও পারতেন না সইতে।
কাগজখানা তুলে ধরে বললেন,—
"বুঝিয়ে দাও তো বাপু, এই কটা লাইন,
দেখি তোমার ইংরেজি বিদ্যে।"
নিষ্ঠুর অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে
মুখ লাল ক'রে উঠতে হল ঘেমে।
ঘরের এককোণে ব'সে
একলা করছিল কড়িখেলা
আমার অপমানের সাক্ষী কণি।
দ্বিধা হল না পৃথিবী,
অবিচলিত রইল চারদিকের নির্মম জগৎ

পরদিন সকালে উঠে দেখি,
সেই কাগজখানা আমার টেবিলে।
শিবরামবাবুর ছবির কাগজ।
এত বড়ো দুঃসাহসের গভীর রসের উৎস কোথায়,
তার মূল্য কত,
সেদিন বুঝতে পারে নি বোকা ছেলে।
ভেবেছিলেম, আমার কাছে কণির
এ শুধু স্পর্ধার বড়াই।

দিনে দিনে বয়স বাড়ছে
আমাদের দুজনের অগোচরে,
তার জন্যে দায়িক নই আমরা।
বয়স-বাড়ার মধ্যে অপরাধ আছে
এ কথা লক্ষ্য করি নি নিজে,
করেছেন শিবরামবাবু।

আমাকে স্নেহ করতেন কণির মা,
তার জবাবে ঝাঁজিয়ে উঠত তাঁর স্বামীর প্রতিবাদ।
একদিন আমার চেহারা নিয়ে খোঁটা দিয়ে
শিবরামবাবু বলছিলেন তাঁর স্ত্রীকে,
আমার কানে গেল,—
"টুক্‌টুকে আমের মতো ছেলে
পচতে করে না দেরি,
ভিতরে পোকার বাসা।"

আমার 'পরে ওঁর ভাব দেখে
বাবা প্রায় বলতেন রেগে,—
"লক্ষ্মীছাড়া, কেন যাস ওদের বাড়ি।"
ধিক্কার হত মনে,
বলতেম দাঁত কামড়ে,—
"যাব না আর কখ্‌খনো।"

যেতে হত তুদিন বাদেই
কুলতলার গলি দিয়ে লুকিয়ে।
মুখ বাঁকিয়ে বসে রইত কণি
তুদিন না-আসার অপরাধে।
হঠাৎ ব'লে উঠত,—
"আড়ি, আড়ি, আড়ি।"
আমি বলতুম, "ভারি তো।"
ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাতুম আকাশের দিকে।

একদিন আমাদের তুই বাড়িতেই এল
বাসা ভাঙবার পালা।
এঞ্জিনিয়র শিবরামবাবু যাবেন পশ্চিমে
কোন্ শহরে আলো-জ্বালার কারবারে
আমরা চলেছি কলকাতায়;
গ্রামের ইস্কুলটা নয় বাবার মনের মতো।
চলে যাবার তুদিন আগে
কণি এসে বললে, "এসো আমাদের বাগানে।"
আমি বললাম "কেন।"
কণি বললে, "চুরি করব তুজনে মিলে;
আর তো পাব না এমন দিন।"
বললেম, "কিন্তু, তোমার বাবা— "
কণি বললে, "ভীতু।"

আমি বললেম মাথা বাঁকিয়ে,-

"একটুও না।"

শিবরামবাবুর শখের বাগান ফলে আছে ভ'রে।
কণি সুধোল, "কোন্ ফল ভালোবাস সব চেয়ে।"
আমি বললেম, "ঐ মজঃফরপুরের লিচু।
কণি বললে, "গাছে চ'ড়ে পাড়তে থাকো,
ধরে রইলেম ঝুড়ি।"
ঝুড়ি প্রায় ভরেছে,
হঠাৎ গর্জন উঠল "কে রে" ;
স্বয়ং শিবরামবাবু।
বললেন, "আর কোনো বিদ্যা হবে না বাপু,
চুরিবিদ্যাই শেষ ভরসা।"
ঝুড়িটা নিয়ে গেলেন তিনি
পাছে ফলবান হয় পাপের চেষ্টা।
কণির দুই চোখ দিয়ে
মোটা মোটা ফোঁটায়
জল পড়তে লাগল নিঃশব্দে ;
গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে
অমন অচঞ্চল কান্না
দেখি নি ওর কোনোদিন।

তারপরে মাঝখানে অনেকখানি ফাঁক

বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি
কণির হয়েছে বিয়ে।
মাথায় উঠেছে লালপেড়ে আঁচল,
কপালে কুঙ্কুম,
শান্তগভীর চোখের দৃষ্টি,
স্বর হয়েছে গম্ভীর।

আমি কলকাতায় রসায়নের কারখানায়
ওষুধ বানিয়ে থাকি।
আমার দিনের পর দিন চলেছে
কর্মচক্রের স্নেহহীন কর্কশধ্বনিতে
একদিন কণির কাছ থেকে চিঠিতে এল
দেখা করতে অনুনয়।
গ্রামের বাড়িতে ভাগনির বিয়ে,
স্বামী পায় নি ছুটি,
ও একা এসেছে মায়ের কাছে।
বাবা গেছেন হুসিয়ারপুরে
বিবাহে মতবিরোধের আক্রোশে।

অনেকদিন পরে এসেছি গ্রামে,
এসেছি প্রতিবেশিনীর সেই বাড়িতে

ঘাটের পাশে ঢালু পাড়িতে
ঝুঁকে রয়েছে সেই হিজল গাছ জলের দিকে,
পুকুর থেকে আসছে
সেই পুরোনো কালের মিষ্টি গন্ধ শ্যাওলার ;
আর সিস্নুগাছের ডালে দুলছে
সেই দোলনাটা আজও।

কণি প্রণাম ক'রে বললে, "অমলদাদা,
থাকি দূর দেশে,
ভাইফোঁটার দিনে পাব তোমায় নেই সে আশা।
আজ অদিনে মেটাব আমার সাধ, তাই ডেকেছি।"
বাগানে আসন পড়েছে অশথতলার চাতালে
অনুষ্ঠান হল সারা,
পায়ের কাছে কণি রাখলে একটি ঝুড়ি,
সে ঝুড়ি লিচুতে ভরা।
বললে, "সেই লিচু।"
আমি বললেম, "ঠিক সে লিচু নয় বুঝি।"
কণি বললে, "কী জানি।"
ব'লেই দ্রুত গেল চলে।

শান্তিনিকেতন
১২ জুন, ১৯৩৬

# বাঁশিওয়ালা

"ওগো বাঁশিওয়ালা,
বাজাও তোমার বাঁশি,
শুনি আমার নূতন নাম"
—এই ব'লে তোমাকে প্রথম চিঠি লিখেছি,
মনে আছে তো ?

আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।
সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেন নি
আমাকে মানুষ ক'রে গড়তে—
রেখেছেন আধাআধি ক'রে।
অন্তরে বাহিরে মিল হয় নি—
সেকালে আর আজকের কালে,
মিল হয় নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে,
মিল হয়নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়।
আমাকে তুলে দেন নি এ যুগের পারানি নৌকোয়,
চলা আটক ক'রে ফেলে রেখেছেন
কালস্রোতের ওপারে বালুডাঙায়।
সেখান থেকে দেখি
প্রখর আলোয় ঝাপসা দূরের জগৎ—
বিনা কারণে কাঙাল মন অধীর হয়ে ওঠে,
দুই হাত বাড়িয়ে দিই,
নাগাল পাই নে কিছুই কোনোদিকে।

বেলা তো কাটে না,
বসে থাকি জোয়ারজলের দিকে চেয়ে—
ভেসে যায় মুক্তি-পারের খেয়া,
ভেসে যায় ধনপতির ডিঙা,
ভেসে যায় চলতি বেলার আলোছায়া।
এমনসময় বাজে তোমার বাঁশি
ভরা জীবনের সুরে।
মরা দিনের নাড়ীর মধ্যে
দব্‌দবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ।

কী বাজাও তুমি,
জানি নে সে-সুর জাগায় কার মনে কী ব্যথা।
বুঝি বাজাও পঞ্চমরাগে
দক্ষিণহাওয়ার নবযৌবনের ভাটিয়ারি।
শুনতে শুনতে নিজেকে মনে হয়—
যে ছিল পাহাড়তলির ঝির্‌ঝিরে নদী,
তার বুকে হঠাৎ উঠেছে ঘনিয়ে
শ্রাবণের বাদলরাত্রি।
সকালে উঠে দেখা যায়, পাড়ি গেছে ভেসে,
একগুঁয়ে পাথরগুলোকে ঠেলা দিচ্ছে
অসহ্য স্রোতের ঘূর্ণিমাতন।
আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর—
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক,

পাঁজরের উপরে আছাড়-খাওয়া
মরণসাগরের ডাক,
ঘরের-শিকল-নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক
যেন হাঁক দিয়ে আসে
অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে
পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি—
ছিনিয়ে নেবে, ভাসিয়ে দেবে বুঝি।
অঙ্গে অঙ্গে পাক দিয়ে ওঠে
কালবৈশাখীর ঘূর্ণি-মার-খাওয়া
অরণ্যের বকুনি।

ডানা দেয় নি বিধাতা—
তোমার গান দিয়েছে আমার স্বপ্নে
ঝোড়ো আকাশে উড়ো প্রাণের পাগলামি

ঘরে কাজ করি শান্ত হয়ে;
সবাই বলে, ভালো।
তারা দেখে আমার ইচ্ছার নেই জোর,
সাড়া নেই লোভের;
ঝাপট লাগে মাথার উপর,
ধুলোয় লুটোই মাথা।
দুরন্ত ঠেলায় নিষেধের পাহারা কাত ক'রে ফেলি
নেই এমন বুকের পাটা।

বেলা তো কাটে না,
বসে থাকি জোয়ারজলের দিকে চেয়ে—
ভেসে যায় মুক্তি-পারের খেয়া,
ভেসে যায় ধনপতির ডিঙা,
ভেসে যায় চলতি বেলার আলোছায়া
এমনসময় বাজে তোমার বাঁশি
ভরা জীবনের সুরে।
মরা দিনের নাড়ীর মধ্যে
দব্‌দবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ।

কী বাজাও তুমি,
জানি নে সে-সুর জাগায় কার মনে কী ব্যথা
বুঝি বাজাও পঞ্চমরাগে
দক্ষিণহাওয়ার নবযৌবনের ভাটিয়ারি।
শুনতে শুনতে নিজেকে মনে হয়—
যে ছিল পাহাড়তলির ঝির্‌ঝিরে নদী,
তার বুকে হঠাৎ উঠেছে ঘনিয়ে
শ্রাবণের বাদলরাত্রি।
সকালে উঠে দেখা যায়, পাড়ি গেছে ভেসে,
একগুঁয়ে পাথরগুলোকে ঠেলা দিচ্ছে
অসহ্য স্রোতের ঘূর্ণিমাতন।
আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর—
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক,

পাঁজরের উপরে আছাড়-খাওয়া
মরণসাগরের ডাক,
ঘরের-শিকল-নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।
যেন হাঁক দিয়ে আসে
অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে
পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি—
ছিনিয়ে নেবে, ভাসিয়ে দেবে বুঝি।
অঙ্গে অঙ্গে পাক দিয়ে ওঠে
কালবৈশাখীর ঘূর্ণি-মার-খাওয়া
অরণ্যের বকুনি।

ডানা দেয় নি বিধাতা—
তোমার গান দিয়েছে আমার স্বপ্নে
ঝোড়ো আকাশে উড়ো প্রাণের পাগলামি

ঘরে কাজ করি শান্ত হয়ে;
সবাই বলে, ভালো।
তারা দেখে আমার ইচ্ছার নেই জোর,
সাড়া নেই লোভের;
ঝাপট লাগে মাথার উপর,
ধুলোয় লুটোই মাথা।
দুরন্ত ঠেলায় নিষেধের পাহারা কাত ক'রে ফেলি
নেই এমন বুকের পাটা।

কঠিন ক'রে জানি নে ভালোবাসতে,
কাঁদতে শুধু জানি,
জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে।

বাঁশিওয়ালা,
বেজে ওঠে তোমার বাঁশি—
ডাক পড়ে অমর্ত্তলোকে ;
সেখানে আপন গরিমায়
উপরে উঠেছে আমার মাথা।
সেখানে কুয়াশার-পর্দা-ছেঁড়া
তরুণ-সূর্য আমার জীবন।
সেখানে আগুনের ডানা মেলে দেয়
আমার বারণ-না-মানা আগ্রহ,
উড়ে চলে অজানা শূন্যপথে
প্রথম-ক্ষুধায়-অস্থির গরুড়ের মতো।
জেগে ওঠে বিদ্রোহিণী,
তীক্ষ্ণ চোখের আড়ে জানায় ঘৃণা
চারিদিকের ভীরুর ভিড়কে ;
কৃশ কুটিলের কাপুরুষতাকে।

বাঁশিওয়ালা,
হয়তো আমাকে দেখতে চেয়েছ তুমি।
জানি নে, ঠিক জায়গাটি কোথায়,
ঠিক সময় কখন—

চিনবে কেমন ক'রে।
দোসরহারা আষাঢ়ের ঝিল্লিঝনক রাত্রে
সেই নারী তো ছায়ারূপে
গেছে তোমার অভিসারে চোখ-এড়ানো পথে।
সেই অজানাকে কত বসন্তে
পরিয়েছ ছন্দের মালা,
শুকোবে না তার ফুল।

তোমার ডাক শুনে একদিন
ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী।
যেন সে হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির,
চমক লাগালো তোমাকেই।
সে নামবে না গানের আসন থেকে ;
সে লিখবে তোমাকে চিঠি
রাগিণীর আবছায়ায় ব'সে।
তুমি জানবে না তার ঠিকানা।

ওগো বাঁশিওয়ালা,
সে থাক্ তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে

শান্তিনিকেতন
১৬ জুন, ১৯৩৬

# মিলভাঙা

এসেছিলে কাঁচা জীবনের
পেলব রূপটি নিয়ে—
এনেছিলে আমার হৃদয়ের প্রথম বিস্ময়,
রক্তে প্রথম কোটালের বান।
আধোচেনার ভালোবাসার মাধুরী
ছিল যেন ভোরবেলাকার
কালো ঘোমটায় সূক্ষ্ম সোনার কাজ—
গোপন শুভদৃষ্টির আবরণ।
মনের মধ্যে তখনও
অসংশয় হয় নি পাখির কাকলী ;
বনের মর্মর একবার জাগে,
একবার যায় মিলিয়ে।

বহুলোকের সংসারের মাঝখানে
চুপিচুপি তৈরি হতে লাগল
আমাদের দুজনের নিভৃত জগৎ।
পাখি যেমন প্রতিদিন
খড়কুটো কুড়িয়ে এনে বাসা বাঁধে
তেমনি সেই জগতের উপকরণ সামান্য,
চলতি মুহূর্তের খসে-পড়া
উড়ে-আসা সঞ্চয় দিয়ে গাঁথা।

তার মূল্য ছিল তার রচনায়,
নয় তার বস্তুতে।

শেষে একদিন দুজনের নৌকো-বাওয়া থেকে
কখন্ একলা গেছ নেমে ;
আমি ভেসে চলেছি স্রোতে,
তুমি বসে রইলে ওপারের ডাঙায়।
মিলল না আর আমার হাতে তোমার হাতে
কাজে কিংবা খেলায়।
জোড় ভেঙে ভাঙল আমাদের জীবনের গাঁথনি।
যে-দ্বীপের শ্যামল ছবিখানি সদ্য আঁকা পড়েছে
সমুদ্রের লীলাচঞ্চল তরঙ্গপটে
তাকে যেমন দেয় মুছে
এক জোয়ারের তুমুল তুফানে,
তেমনি মিলিয়ে গেল আমাদের কাঁচা জগৎ
সুখদুঃখের নতুন-অঙ্কুর-মেলা
শ্যামল রূপ নিয়ে।

তারপরে অনেক দিন গেছে কেটে।
আষাঢ়ের আসন্নবর্ষণ সন্ধ্যায়
যখন তোমাকে দেখি মনে মনে,
দেখতে পাই তুমি আছ

সেইদিনকার কচি যৌবনের মায়া দিয়ে ঘেরা।
তোমার বয়স গেছে থেমে।
তোমার সেই বসন্তের আমের বোলে
আজও তেমনি গন্ধেরই ঘোষণা ;
তোমার সেদিনকার মধ্যাহ্ন
আজ মধ্যাহ্নেও ঘুঘুর ডাকে তেমনি বিরহাতুর।
আমার কাছে তোমার স্মরণ রয়ে গেছে
প্রকৃতির বয়সহারা এই-সব পরিচয়ের দলে।
সুন্দর তুমি বাঁধা রেখায়,
প্রতিষ্ঠিত তুমি অচল ভূমিতে।

আমার জীবনধারা
কোথাও রইল না থেমে।
দুর্গমের মধ্যে, গভীরের মধ্যে,
মন্দভালোর দ্বন্দ্ববিরোধে,
চিন্তায়, সাধনায়, আকাঙ্ক্ষায়,
কখনও সফলতায়, কখনও প্রমাদে,
চলে এসেছি তোমার জানা সীমার
বহুদূর বাইরে—
সেখানে আমি তোমার কাছে বিদেশী।
সেই তুমি আজ এই মেঘ-ডাকা সন্ধ্যায়
যদি এসে ব'স আমার সামনে,
দেখতে পাবে আমার চোখে

দিক-হারানো চাহনি
অজানা আকাশের সমুদ্রপারে
নীল অরণ্যের পথে।

তুমি কি পাশে বসে শোনাবে
সেদিনকার কানে-কানে কথার উদ্‌বৃত্ত।
কিন্তু, ঢেউ করছে গর্জন,
শকুন করছে চীৎকার,
মেঘ ডাকছে আকাশে,
মাথা নাড়ছে নিবিড় শালের বন।
তোমার বাণী হবে খেলার ভেলা
খেপাজলের ঘূর্ণিপাকে।

সেদিন আমার সব মন
মিলেছিল তোমার সব মনে,
তাই প্রকাশ পেয়েছে নূতন গান
প্রথম সৃষ্টির আনন্দে।
মনে হয়েছে,
বহুযুগের আশ মিটল তোমাতে আমাতে।
সেদিন প্রতিদিনই বয়ে এনেছে
নূতন আলোর আগমনী
আদিকালে সদ্য-চোখ-মেলা তারার মতো

আজ আমার যন্ত্রে
তার চড়েছে বহুশত—
কোনোটা নয় তোমার জানা।
যে সুর সেধে রেখেছি সেদিন
সে সুর লজ্জা পাবে এর তারে।
সেদিন যা ছিল ভাবের লেখা
আজ হবে তা দাগা-বুলোনো।

তবু জল আসে চোখে।
এই সেতারে নেমেছিল তোমার আঙুলের
প্রথম দরদ ;
এর মধ্যে আছে তার জাদু।
এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে
কিশোর-বয়সের শ্যামল পারের থেকে ;
এর মধ্যে আছে তার বেগ।
আজ মাঝনদীতে সারিগান গাইব যখন
তোমার নাম পড়বে বাঁধা
তার হঠাৎ তানে।

শান্তিনিকেতন
২০ জুন, ১৯৩৬

# হঠাৎ-দেখা

রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা,
ভাবি নি সম্ভব হবে কোনোদিন

আগে ওকে বারবার দেখেছি
লালরঙের শাড়িতে
দালিম ফুলের মতো রাঙা ;
আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়,
আঁচল তুলেছে মাথায়
দোলনচাঁপার মতো চিকনগৌর মুখখানি ঘিরে।
মনে হল, কালো রঙে একটা গভীর দূরত্ব
ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চারদিকে,
যে দূরত্ব সর্ষেখেতের শেষ সীমানায়
শালবনের নীলাঞ্জনে।
থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা ;
চেনা লোককে দেখলেম অচেনার গাম্ভীর্যে।

হঠাৎ খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে
আমাকে করলে নমস্কার
সমাজবিধির পথ গেল খুলে,
আলাপ করলেম শুরু—

কেমন আছ, কেমন চলছে সংসার
ইত্যাদি।

সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে
যেন কাছের দিনের ছোঁয়াচ-পার-হওয়া চাহনিতে।
দিলে অত্যন্ত ছোটো দুটো-একটা জবাব,
কোনোটা বা দিলেই না।
বুঝিয়ে দিলে হাতের অস্থিরতায়—
কেন এ-সব কথা,
এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ ক'রে থাকা।

আমি ছিলেম অন্য বেঞ্চিতে
ওর সাথিদের সঙ্গে।
এক সময়ে আঙুল নেড়ে জানালে কাছে আসতে।
মনে হল, কম সাহস নয়;
বসলুম ওর এক-বেঞ্চিতে।
গাড়ির আওয়াজের আড়ালে
বললে মৃদুস্বরে,—
"কিছু মনে কোরো না,
সময় কোথা সময় নষ্ট করবার।
আমাকে নামতে হবে পরের স্টেশনেই;
দূরে যাবে তুমি,
দেখা হবে না আর কোনোদিনই।

তাই যে প্রশ্নটার জবাব এতকাল থেমে আছে,
শুনব তোমার মুখে।
সত্য ক'রে বলবে তো ?"

আমি বললেম, "বলব।"
বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই সুধোল,—
"আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে,
কিছুই কি নেই বাকি।"

একটুকু রইলেম চুপ ক'রে :
তারপর বললেম,—
"রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।"

খটকা লাগল, কী জানি বানিয়ে বললেম না কি।
ও বললে, "থাক্, এখন যাও ওদিকে।"
সবাই নেমে গেল পরের স্টেশনে ;
আমি চললেম একা।

শান্তিনিকেতন
২৪ জুন, ১৯৩৬

# কালরাত্রে

কাল রাত্রে
বাদলের-দানোয়-পাওয়া অন্ধকারে
বর্ষণের রিম্‌ঝিম্‌ প্রলাপে
চাপা দিয়েছিল
সন্ন্যাসী নিশীথের ধ্যানমন্ত্র।
জড়ত্বে ছিলেম পরাভূত,
ছিলেম উপবাসী ;
ছিল শিথিলশক্তি ধূলিশয়ান।
বুকে ভর দিয়ে বসেছিল
সমস্ত আকাশের সঙ্গহীনতা।
"চাই চাই" ক'রে কেঁদে উঠেছিল প্রাণ
প্রহরে প্রহরে নিশাচর পাখির মতো।
নানা নাম ধরেছিল ভিক্ষা,
অন্তরের অন্ধস্তরে শিকড় চালিয়েছিল
আঁকাবাঁকা অশুচি কান্নার।
"চাই চাই" ব'লে
শূন্য হাতড়ে বেড়িয়েছিল রাতকানা
যাকে চায় তাকে না জেনে।
শেষে ক্রুদ্ধ গর্জনে হেঁকে উঠল,—
"নেই সে নেই, কোথাও নেই।"

সত্যহারা শূন্যতার গর্ত থেকে
কালো কামনার সাপের বংশ
বেরিয়ে এসে জড়িয়েছে কাঙালকে—
নাস্তিত্বের সেই শিকলবাঁধা ভৃত্যকে—
নিরর্থের বোঝায়
বেঁকেছে যার পিঠ,
নেমেছে যার মাথা

ভোর হল রাত্রি।
আষাঢ়ের সকালে অকস্মাৎ হাওয়ায়
ঘন মেঘের দুর্গপ্রাচীর
পড়ল ভেঙেচুরে।
ছুটে বেরিয়ে এসেছে
প্রভাতের বাঁধনছেঁড়া আলো।
মুক্তির আনন্দঘোষণা
বেজে উঠল আকাশে আকাশে
আগুনের ভাষায়।
পাখিদের ছোটো কোমল তনুতে
দুরন্ত হয়ে উঠল প্রাণের উৎসুক ছন্দ।
চলল তাদের সুরের তীরখেলা
কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে, শাখা থেকে শাখায়।
সেতারের দ্রুততালের বাজন যেন
পাতায় পাতায় আলোর চমক।

মন দাঁড়িয়ে উঠল ;
বললে, আমি পূর্ণ ।
তার অভিষেক হল
আপনারই উদ্‌বেল তরঙ্গে ।
তার আপন সঙ্গ
আপনাকে করলে বেষ্টন
শিলাতটকে ঝরনার মতো—
উপচে উঠে মিলতে চলল
চারদিকের সব-কিছুর মধ্যে
চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান ।
প্রভাতসূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ :
ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া,
পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা,
গান গাইলেম "চাই নে কিছু চাই নে"—
যেমন গাইছে রক্তপদ্মের রক্তিমা,
যেমন গাইছে সমুদ্রের ঢেউ,
সন্ধ্যাতারার শান্তি,
গিরিশিখরের নির্জনতা ।

শান্তিনিকেতন
২৩ জুন, ১৯৩৬

# অমৃত

বিদায় নিয়ে চলে আসবার বেলা বললেম তাকে,
"ভারতের একজন নারী বলেছিলেন একদিন,-
উপকরণ চান না তিনি,
তিনি চান অমৃত।
এই তো নারীর পণ,
তুমি কী বলো।"
অমিয়া হাসল একটু বিরস হাসি :
বললে, "এ কি উপদেশ।"
আমি বললেম তার হাত চেপে ধরে,
"ভালোবাসাই সেই অমৃত,
উপকরণ তার কাছে তুচ্ছ,
বুঝবে একদিন।"

বিরক্ত হল অমিয়া ;
বললে, "তুমি কেন নিয়ে গেলে না আমাকে মিথ্যে থেকে।
জোর নেই কেন তোমার।"
আমি বললেম, "বাধে আত্মগৌরবে।
যতদিন না ধনে হব সমান
আসব না তোমার কাছে।"
অমিয়া মাথা-ঝাঁকানি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো,
চলল ঘরের বাইরে।

আমি বললেম, "শুনে রাখো,
তোমার ভালোবাসার বদলে
দেব না তোমাকে অকিঞ্চনের অসম্মান।
এই আমার পুরুষের পণ।"

দিন যায়, রাত যায়,
মাথায় চড়ে ওঠে সোনার মদের নেশা।
সঞ্চয়ের ধাক্কা যতই বাড়ে
ততই আমাকে চলে ঠেলে।
থামতে পারি নে, থামাতে পারিনে তার তাড়না।
বিত্ত বাড়ে, খ্যাতি বাড়ে,
বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে আত্মশ্লাঘা।
শেষে ডাক্তার বললে, বিশ্রাম চাই নিতান্তই—
দেহের কল অচল হয়ে এল ব'লে।

গেলেম দূরদেশে নির্জনে।
সেখানে সমুদ্রের একটা খাড়ি এসে মিলেছে
পাহাড়তলির অরণ্যে।
ভিড় জমেছে গাছে গাছে
মাছধরা পাখিদের পাড়ায়।
ক্ষীণ নদীটি ঝরে পড়ছে পাহাড় থেকে
পাথরের ধাপে ধাপে।
নুড়ি ডিঙিয়ে বেঁকে-চলা

তার ফটিক-জলের কল্‌কলানি
ধরিয়ে রেখেছে একটি মূল সুর নির্জনতার।
নিত্য-স্নান-করা সেখানকার হাওয়া
চলেছে মন্ত্র গুন্‌গুনিয়ে বনের থেকে বনে।
দল বেঁধেছে নারকেল গাছ—
কেউ খাড়া, কেউ হেলে-পড়া,
দিনরাত ওদের ঝালর-ঝোলা অস্থিরপনা।
ফিরে ফিরে আছাড় খেয়ে ফেনিয়ে উঠছে জেদালো ঢেউ
মোটা মোটা কালো পাথরে :
ডাঙায় ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে
ঝিনুক শামুক শ্যাওলা।
ক্লান্ত শরীর ব্যস্ত মনকে ফিরিয়েছে
শান্ত রক্তধারার স্নিগ্ধতায়।
কর্মের নেশার ঝাঁজ এল মরে।
এতকালের খাটুনি মনে হল যেন ফাঁকি,
প্রাণ উঠল দু হাত বাড়িয়ে
জীবনের সাঁচ্চা সোনার জন্যে।

সেদিন ঢেউ ছিল না জলে।
আশ্বিনের রোদ্‌দুর কাঁপছে
সমুদ্রের শিহর-লাগা নীলিমায়।
বাসার ধারে পুরোনো ঝাউ গাছে

ধেয়ে আসছে খাপছাড়া হাওয়া ;
ঝরঝর ক'রে উঠছে তার পাতা
বেগনি রঙের পাখি, বুকের কাছে সাদা—
টেলিগ্রাফের তারে ব'সে লেজ দুলিয়ে
ডাকছে মিষ্টি মৃদু চাপা সুরে।
শরৎ-আকাশের নির্মল নীলে ছড়িয়ে আছে
কোন্ অনাদি নির্বাসনের গভীর বিষাদ।
মনের মধ্যে হুহু ক'রে উঠছে,—
"ফিরে যেতে হবে।"
থেকে থেকে মনে পড়ছে,
সেদিনকার সেই জল-মুছে-ফেলা চোখে
ঝলে উঠেছিল যে-আলো।

সেইদিনই চড়লুম জাহাজে।
বন্দরে নেমেই এসেছি চলে।
রাস্তার বাঁকে এসে চাইলেম বাড়ির দিকে ;
মনে হল, সেখানে বাস নেই কারও।
এলেম সদর দরজার সামনে ;
দেখি, তালা বন্ধ।
ধক্ ক'রে উঠল বুকের মধ্যে ;
বাড়ির ভিতর থেকে শূন্যতার দীর্ঘনিশ্বাস এসে
লাগল আমার অন্তরে।

অনেক সন্ধানের পর
দেখা হল শেষে।
কোন্ বারো-ভুঁইঞাদের আমলের
একখানা তিনকাল-পেরোনো গ্রাম
একটি পুরোনো দিঘির ধারে ;
দিঘির নামেই লোচনদিঘি তার নাম।
সেখানে ভুলে-যাওয়া তারিখের
ঝাপসা অক্ষরপটওয়ালা
ভাঙা দেবালয়।
পূর্বখ্যাতির কোনো সাক্ষী রাখে নি ;
আছে সে অশ্বত্থের পাঁজরভাঙা
আলিঙ্গনে জড়িয়ে পড়া।
পাড়ির উপরে বুড়ো বটের তলায়
একটি নূতন আটচালা ঘর,
সেইখানে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়।

দেখলুম অমিয়াকে—
ছাইরঙের মোটা শাড়িপরা,
দুই হাতে দুইগাছি শাঁখা,
পায়ে নেই জুতো,
ঢিলে খোঁপা অযত্নে পড়েছে ঝুলে।
পাড়াগাঁয়ের শ্যামল রঙ লেগেছে মুখে।
ছোটো ঝারি হাতে পাঠশালার বাগানে

জল দিচ্ছে সবজিখেতে।
ভেবে পেলেম না কী বলি।
তারও মুখে এল না
প্রথম-দেখার কোনো সম্ভাষণ,
কোনো প্রশ্ন।

চোখের আড়ে
আমার দামি জুতোজোড়াটার দিকে তাকিয়ে
বললে অনায়াসে,—
"বেশি বর্ষায় আগাছায় চাপা পড়েছে
বিলিতি বেগুনের চারা;
এসো-না, নিড়িয়ে দেবে।"
বোঝা গেল না, ঠাট্টা কি সত্যি।
জামার আস্তিনে ছিল মুক্তোর বোতাম,
লুকিয়ে আস্তিনটা দিলেম উলটিয়ে।
অমিয়ার জন্যে একটা ব্রোচ ছিল পকেটে,
বুঝলেম, দিতে গেলে
হীরেটাতে লাগবে প্রহসনের হাসি।
একটু কেশে সুধালেম,—
"এখানে থাক কোথায়।"
ঝারি রেখে দিয়ে বললে, "দেখবে?"
নিয়ে গেল স্কুলের মধ্যে,
দালানের পুব দিকটাতে
শতরঞ্জের পর্দা দিয়ে ভাগ-করা ঘরে।

একটা তক্তপোষের উপর
বিছানা রয়েছে গোটানো

টুলের উপর সেলাইয়ের কল,
ছিটের-খাপে-ঢাকা সেতার
দেয়ালে-ঠেসান-দেওয়া।
দক্ষিণের দরজার সামনে মাদুর পাতা,
তার উপরে ছড়িয়ে আছে
ছাঁটা কাপড়, নানা রঙের ফিতে,
রেশমের মোড়ক।
উত্তরকোণের দেয়ালে
ছোটো টিপায়ে হাত-আয়না,
চিরুনি, তেলের শিশি,
বেতের ঝুড়িতে টুকিটাকি।
দক্ষিণকোণের দেয়ালের গায়ে
ছোটো টেবিলে লেখবার সামগ্রী,
আর রঙকরা মাটির ভাঁড়ে
একটি স্থলপদ্ম।
অমিয়া বললে, "এই আমার বাসা,
একটু বোসো, আসছি আমি।"

বাইরে জটা-ঝোলা বটের ডালে
ডাকছে কোকিল।

মানকচুর ঝোপের পাশে
বিষম খেপে উঠেছে একদল ঝগড়াটে শালিখ।
দেখা যায়, ঝিল্‌মিল্‌ করছে
ঢালুপাড়ির তলায়
দিঘির উত্তরধারের একটুকরো জল,
কলমি শাকের পাড় দেওয়া।
চোখে পড়ল, লেখবার টেবিলে একটি ছবি—
অল্প বয়সের যুবা, চিনি নে তাকে—
কয়লায় আঁকা, কাঁচকড়ার ফ্রেমে বাঁধানো—
ফলাও তার কপাল, চুল আলুথালু,
চোখে যেন দূর ভবিষ্যের আলো,
ঠোঁটে যেন কঠিন পণ তালা-আঁটা।

এমনসময় অমিয়া নিয়ে এল
থালায় ক'রে জলখাবার—
চিঁড়ে, কলা, নারকেল-নাড়ু,
কালো পাথরবাটিতে দুধ,
এক-গেলাস ডাবের জল।
মেঝের উপর থালা রেখে
পশমে-বোনা একটা আসন দিল পেতে।
'খিদে নেই' বললে মিথ্যে হত না
'রুচি নেই' বললে সত্য হত,
কিন্তু, খেতেই হল।

## ৮১

## তারপরে শোনা গেল খবর

আমার ব্যবসায়ে আমদানি যখন জমে উঠেছে ব্যাঙ্কে,
যখন হুঁশ ছিল না আর-কোনো জমাখরচে,
তখন অমিয়ার বাবা কুঞ্জকিশোর বাবু
মাঝে মাঝে লক্ষপতির ঘরের
দুর্লভ দুই-একটি ছেলেকে
এনেছিলেন চায়ের টেবিলে।
সব সুযোগই ব্যর্থ করেছে বারে বারে
তাঁর একগুঁয়ে মেয়ে।
কপাল চাপড়ে হাল ছেড়েছেন যখন তিনি
এমন সময় পারিবারিক দিগন্তে
হঠাৎ দেখা দিল কক্ষছাড়া পাগলা জ্যোতিষ্ক—
মাধপাড়ার রায়বাহাদুরের একমাত্র ছেলে মহীভূষণ।
রায়বাহাদুর জমা টাকা আর জমাট বুদ্ধিতে
দেশবিখ্যাত।
তাঁর ছেলেকে কোনো কন্যার পিতা পারে না হেলা করতে
যতই সে হোক লাগাম-ছেঁড়া।
আট বছর য়ুরোপে কাটিয়ে মহীভূষণ ফিরেছেন দেশে।
বাবা বললেন, "বিষয়কর্ম দেখো।"
ছেলে বললে, "কী হবে।"
লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে
রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা।

অমিয়ার বাবা বললেন, ভয় নেই,
নরম হয়ে এল ব'লে দেশের ভিজে হাওয়ায়।
দুদিনে অমিয়া হল তার চেলা।
যখন-তখন আসত মহীভূষণ,
আশপাশের হাসাহাসি কানাকানি গায়ে লাগত না কিছুই

দিনের পর দিন যায়।
অধীর হয়ে অমিয়ার বাবা তুললেন বিয়ের কথা।
মহী বললে, "কী হবে।"
বাবা রেগে বললেন, "তবে তুমি আস কেন রোজ।"
অনায়াসে বললে মহীভূষণ,
"অমিয়াকে নিয়ে যেতে চাই যেখানে ওর কাজ।'

অমিয়ার শেষ কথা এই,—
"এসেছি তাঁরই কাজে।
উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার
আমি সুধালেম, "কোথায় আছেন তিনি।"
অমিয়া বললে, "জেলখানায়।"

শান্তিনিকেতন
৩ জুলাই, ১৯৩৬

# দুর্বোধ

অধ্যাপকমশায় বোঝাতে গেলেন নাটকটার অর্থ,
সেটা হয়ে উঠল বোধের অতীত।
আমার সেই নাটকের কথা বলি।—

বইটার নাম 'পত্রলেখা',
নায়ক তার কুশলসেন।
নবনীর কাছে বিদায় নিয়ে সে গেল বিলেতে।
চার বছর পরে ফিরে এসে হবে বিয়ে।
নবনী কাঁদল উপুড় হয়ে বিছানায়;
তার মনে হল, এ যেন চার বছরের মৃত্যুদণ্ড।

নবনীকে কুশলের প্রয়োজন ছিল না ভালোবাসার পথে,
প্রয়োজন ছিল সুগম করতে বিলাতযাত্রার পথ।
সে কথা জানত নবনী;
সে পণ করেছিল, হৃদয় জয় করবে প্রাণপণ সাধনায়।
কুশল মাঝে মাঝে
রুচিতে বুদ্ধিতে উঁচট খেয়ে ওকে হঠাৎ বলেছে রূঢ় কথা,
ও সয়েছে চুপ করে;
মেনে নিয়েছে নিজেকে অযোগ্য ব'লে;
ওর নালিশ নিজেরই উপরে।

ভেবেছিল, দীনা ব'লেই একদিন হবে ওর জয়,
ঘাস যেমন দিনে দিনে নেয় ঘিরে কঠোর পাহাড়কে।
এ যেন ছিল ওর ভালোবাসার শিল্পরচনা,
নির্দয় পাথরটাকে ভেঙে ভেঙে রূপ আবাহন করা
ব্যথিত বক্ষের নিরন্তর আঘাতে।
আজ নবনীর সেই দিনরাতের আরাধনার ধন গেল দূরে।
ওর দুঃখের থালাটি ছিল অশ্রুভেজা অর্ঘ্যে ভরা,
আজ থেকে দুঃখ রইবে কিন্তু দুঃখের নৈবেদ্য রইবে না।
এখন ওদের সম্বন্ধের পথ রইল
শুধু এপারে ওপারে চিঠি-লেখার সাঁকো বেয়ে।
কিন্তু নবনী তো সাজিয়ে লিখতে জানে না মনের কথা,
ও কেবল যত্নের স্বাদ লাগাতে জানে সেবাতে,
অর্‌কিডের চমক দিয়ে যেতে ফুলদানির 'পরে
কুশলের চোখের আড়ালে,
গোপনে বিছিয়ে আসতে
নিজের-হাতে-কাজ-করা আসন
যেখানে কুশল পা রাখে।

কুশল ফিরল দেশে,
বিয়ের দিন করল স্থির।
আঙটি এনেছে বিলেত থেকে,
গেল সেটা পরাতে ;
গিয়ে দেখে ঠিকানা না রেখেই নবনী নিরুদ্দেশ

তার ডায়ারিতে আছে লেখা,
"যাকে ভালোবেসেছি সে ছিল অন্য মানুষ ;
চিঠিতে যার প্রকাশ, এ তো সে নয়।"
এদিকে কুশলের বিশ্বাস
তার চিঠিগুলি গদ্যে মেঘদূত,
বিরহীদের চিরসম্পদ।
আজ সে হারিয়েছে প্রিয়াকে
কিন্তু মন গেল না চিঠিগুলি হারাতে—
ওর মমতাজ পালালো, রইল তাজমহল।
নাম লুকিয়ে ছাপালো চিঠি 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমিক' আখ্যা দিয়ে।

নবনীর চরিত্র নিয়ে
বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা হয়েছে বিস্তর।
কেউ বলেছে, বাঙালির মেয়েকে
লেখক এগিয়ে নিয়ে চলেছে
ইবসেনের মুক্তিবাণীর দিকে ;
কেউ বলেছে, রসাতলে।

অনেকে এসেছে আমার কাছে জিজ্ঞাসা নিয়ে ;
আমি বলেছি, "আমি কী জানি।"
বলেছি, "শাস্ত্রে বলে, দেবা ন জানন্তি।"
পাঠকবন্ধু বলেছে,—

"নারীর প্রসঙ্গে না-হয় চুপ করলেম
হতবুদ্ধি দেবতারই মতো,
কিন্তু পুরুষ ?
তারও কি অজ্ঞাতবাস চিররহস্যে।
ও মানুষটা হঠাৎ পোষ মানলে কোন্ মন্ত্রে।"

আমি বলেছি,—
"মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক, স্পষ্ট নয় কোনো পক্ষই ;
যেটুকু সুখ দেয় বা দুঃখ দেয় স্পষ্ট কেবল সেইটুকুই।
প্রশ্ন কোরো না,
পড়ে দেখো কী বলছে কুশল।"—

কুশল বলে, "নবনী চার বছর ছিল দৃষ্টির বাইরে,
যেন নেমে গেল সৃষ্টির বাইরেতেই ;
ওর মাধুর্যটুকুই রইল মনে,
আর সব-কিছু হল গৌণ।
সহজ হয়েছে ওকে সুন্দর ছাঁদে চিঠি লিখতে।
অভাব হয়েছে, করেছি দাবি ;
ওর ভালোবাসার উপর অবাধ ভরসা
মনকে করেছে রসসিক্ত, করেছে গর্বিত।
প্রত্যেক চিঠিতে আপন ভাষায় ভুলিয়েছি আপনারই মন।
লেখার উত্তাপে ঢালাই-করা অলংকার
ওর স্মৃতির মূর্তিটিকে সাজিয়ে তুলেছে দেবীর মতো।

ও হয়েছে নূতন রচনা।
এই জন্যেই খৃস্টান শাস্ত্রে বলে,—
সৃষ্টির আদিতে ছিল বাণী

পাঠকবন্ধু আবার জিগেস করেছে,
"ও কি সত্যি বললে,
না, এটা নাটকের নায়কগিরি।"
আমি বলেছি, "আমি কী জানি।"

শান্তিনিকেতন
৫ জুলাই, ১৯৩৬

## বঞ্চিত

ফুলিদের বাড়ি থেকে এসেই দেখি
পোস্টকার্ডখানা আয়নার সামনেই,
কখন এসেছে জানিনে তো।
মনে হল, সময় নেই একটুও ;
গাড়ি ধরতে পারব না বুঝি।
বাক্স থেকে টাকা বের করতে গিয়ে
ছড়িয়ে পড়ল শিকি দুয়ানি,
কিছু কুড়োলেম, কিছু রইল বা,
গ'নে ওঠা হল না।
কাপড় ছাড়ি কখন।
নীলরঙের রেশমি রুমালখানা
দিলেম মাথার উপর তুলে কাঁটায় বিঁধে।
চুলটাকে জড়িয়ে নিলুম কোনোমতে,
টবের গাছ থেকে তুলে নিলুম
চন্দ্রমল্লিকা বাসন্তীরঙের।

স্টেশনে এসে দেখি, গাড়ি আসেই না ;
জানিনে কতক্ষণ গেল—
পাঁচ মিনিট, হয়তো বা পঁচিশ মিনিট

গাড়িতে উঠে দেখি চেলি-পরা বিয়ের কনে দলে-বলে ;
আমার চোখে কিছুই পড়ে না যেন—
খানিকটা লালরঙের কুয়াশা, একখানা ফিকে ছবি।

গাড়ি চলেছে ঘটর-ঘটর, বেজে উঠছে বাঁশি,
উড়ে আসছে কয়লার গুঁড়ো,
কেবলই মুখ মুচছি রুমালে।
কোন্ এক স্টেশনে
বাঁকে ক'রে ছানা এনেছে গয়লার দল।
গাড়িটাকে দেরি করাচ্ছে মিছিমিছি।
হুইস্‌ল্ দিলে শেষকালে ;
সাড়া পড়ল চাকাগুলোয়, চলল গাড়ি।
গাছপালা, ঘরবাড়ি, পানাপুকুর
ছুটেছে জানলার ছুধারে পিছনের দিকে—
পৃথিবী যেন কোথায় কী ফেলে এসেছে ভুলে,
ফিরে আর পায় কি না-পায়।
গাড়ি চলেছে ঘটর-ঘটর।

মাঝখানে অকারণে গাড়িটা থামল অনেকক্ষণ,
খেতে খেতে খাবার গলায় বেধে যাবার মতো।
আবার বাঁশি বাজল,
আবার চলল গাড়ি ঘটর-ঘটর।

শেষে দেখা দিল হাবড়া স্টেশন।
চাইলেম না জানালার বাইরে,
মনে স্থির ক'রে আছি—
খুঁজতে খুঁজতে আমাকে আবিষ্কার করবে একজন এসে,
তারপরে দুজনের হাসি।

বিয়ের কনে, টোপর-হাতে আত্মীয়স্বজন,
সবাই গেল চলে।
কুলি এসে চাইলে মুখের দিকে ;
দেখলে গাড়ির ভিতরটাতে মুখ বাড়িয়ে,
কিছুই নেই।
যারা কনেকে নিতে এসেছিল গেল চলে।
যে-জনস্রোত এ মুখে আসছিল
ফিরল গেটের দিকে।
গট্‌গট্‌ ক'রে চলতে চলতে
গার্ড আমার জানালার দিকে একটু তাকালে :
ভাবলে, মেয়েটা নামে না কেন।
মেয়েটাকে নামতেই হল।

এই আগন্তুকের ভিড়ের মধ্যে
আমি একটিমাত্র খাপছাড়া।
মনে হল. প্লাট্‌ফরম্‌টার
এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত প্রশ্ন করছে আমাকে ;

জবাব দিচ্ছি নীরবে,—
"না এলেই হত।"
আর-একবার পড়লুম পোস্টকার্ডখানা-
ভুল করিনি তো।

এখন ফিরতি গাড়ি নেই একটাও।
যদি বা থাকত, তবু কি—
বুকের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে
কত রকমের 'হয়তো'।
সবগুলিই সাংঘাতিক।

বেরিয়ে এসে তাকিয়ে রইলুম ব্রিজটার দিকে।
রাস্তার লোক কী ভাবলে জানিনে।
সামনে ছিল বাস, উঠে পড়লুম।
ফেলে দিলুম চন্দ্রমল্লিকাটা।

## অপর পক্ষ

সময় একটুও নেই।
লাল মখমলের জুতোটা গেল কোথায় ;
বেরোল খাটের নিচে থেকে।
গলার বোতাম লাগাতে লাগাতে গেছি চৌকাঠ পর্যন্ত,
হঠাৎ এলেন বাবা।
আলাপ শুরু করলেন ধীরে সুস্থে ;
খবর পেয়েছেন দুজন পাত্রের, মিনির জন্যে।
তাঁর মনটা একবার এর দিকে ঝুঁকছে, একবার ওর দিকে
ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি আর উঠছি ঘেমে।

রাস্তায় বেরোলেম ;
হাওড়ায় গাড়ি আসতে বারো মিনিট।
বুকের মধ্যে রক্তবেগ মন্দগতি সময়কে মারছে ঠেলা।
ট্যাক্সি ছুটল বে-আইনি চালে
হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড,
হাওড়া ব্রিজ, ন' মিনিট বাকি।
দুর্ভাগ্য আর গোরুর গাড়ি আসে যখন
আসে ভিড় ক'রে।
রাস্তাটা পিণ্ডি পাকিয়ে গেছে পাট-বোঝাই গাড়িতে
হাঁক ডাক আর ধাক্কা লাগালে কনিস্টবল ;
নিরেট আপদ, ফাঁক দেয় না কোথাও।

নেমে পড়লুম ট্যাক্সি ছেড়ে,
হন্‌হনিয়ে চললুম পায়ে হেঁটে।
পৌঁছলুম হাওড়া স্টেশনে
কী জানি, কবজিঘড়িটা ফাস্ট হয় যদি পনেরো মিনিট।
কী জানি, আজ থেকে টাইমটেবিলের
সময় যদি পিছিয়ে থাকে।
ঢুকে পড়লুম ভিতরে।
দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি ট্রেন—
যেন আদিকালের প্রকাণ্ড সরীসৃপটার কঙ্কাল,
যেন একঘেয়ে অর্থের গ্রন্থিতে বাঁধা
অমরকোষের একটা লম্বা শব্দাবলী।
নির্বোধের মতো এলেম উঁকি মেরে মেয়ে-গাড়িগুলোতে।
ডাকলেম নাম ধ'রে,
'কী জানি' ছাড়া আর-কোনো কারণ নেই
সেই পাগলামির।
ভগ্ন আশা শূন্য প্লাট্‌ফরম্ জুড়ে ভূলুণ্ঠিত

বেরিয়ে এলুম বাইরে—
জানিনে যাই কোন্‌দিকে।
বাস্‌-এর নিচে চাপা পড়িনি নিতান্ত দৈবক্রমে
এই দয়াটুকুর জন্যে ইচ্ছে নেই
দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

# শ্যামলী

ওগো শ্যামলী,
আজ শ্রাবণে তোমার কালো কাজল চাহনি
চুপ-ক'রে-থাকা বাঙালি মেয়েটির
ভিজে চোখের পাতায় মনের কথাটির মতো।
তোমার মাটি আজ সবুজ ভাষায় ছড়া কাটে ঘাসে ঘাসে
আকাশের বাদল-ভাষার জবাবে।
ঘন হয়ে উঠল তোমার জামের বন পাতার মেঘে,
বলছে তারা উড়ে-চলা মেঘগুলোকে হাত তুলে,
"থামো, থামো,—
থামো তোমরা পুব বাতাসের সওয়ারি।"

পথের ধারে গাছতলাতে তোমার বাসা, শ্যামলী,
তুমি দেবতাপাড়ায় বেদের মেয়ে ;
বাসা ভাঙ' বারে বারে, খালি হাতে বেরিয়ে পড়' পথে,
এক নিমেষে তুমি নিঃশেষে গরিব, তুমি নির্ভাবনা।
তোমাকে যে ভালোবেসেছে
গাঁঠছড়ার বাঁধন দাও না তাকে ;
বাসরঘরের দরজা যখন খোলে রাতের শেষে
তখন আর কোনোদিন চায় না সে পিছন ফিরে।

মুখোমুখি বসব ব'লে বেঁধেছিলেম মাটির বাসা
তোমার কাঁচা-বেড়া-দেওয়া আঙিনাতে।
সেদিন গান গাইল পাখিরা,
তাদের নেই অচল খাঁচা ;
তারা নীড় যেমন বাঁধে তেমনি আবার ভাঙে।
বসন্তে এ পারে তাদের পালা, শীতের দিনে ওপারের অরণ্যে।

সেদিন সকালে
হাওয়ার তালে হাততালি দিলে গাছের পাতা
আজ তাদের নাচ বনে বনে,
কাল তাদের ধুলোয় লুটিয়ে-পড়া–
তা নিয়ে নেই বিলাপ, নেই নালিশ।
বসন্ত-রাজদরবারের নকিব ওরা ;
এ বেলায় ওদের কাজ, জবাব মেলে ও বেলায়।

এই ক'টা দিন তোমায় আমায় কথা হল কানে কানে,
আজ কানে কানে বলছ আমায়,—
"আর নয়, এবার তোলো বাসা।"
আমি পাকা ক'রে গাঁথিনি ভিত,
আমার মিনতি ফাঁদিনি পাথর দিয়ে তোমার দরজায় ;
বাসা বেঁধেছি আলগা মাটিতে—
যে চলতি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে,
যে মাটি পড়বে গ'লে শ্রাবণধারায়।

যাব আমি।

তোমার ব্যথাবিহীন বিদায়দিনে

আমার ভাঙাভিটের 'পরে গাইবে দোয়েল লেজ দুলিয়ে।

এক সাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী,

যেদিন আসি আবার যেদিন যাই চলে।

৬ আগস্ট, ১৯৩৬